দেশ পেয়েছে স্বাধীনতা জাতি পায়নি মুক্তি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা আসলে এটা একটা স্বপ্ন, একটা সমষ্টিগত স্বপ্ন, সমষ্টিগত মুক্তির স্বপ্ন। এ স্বপ্নটাকে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলছি তখন কিন্তু আমরা এটাকে স্বাধীনতার চেতনা থেকে আলাদা করছি। স্বাধীনতা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন। এই স্বাধীনতা আমরা দু দু বার পেয়েছি, একবার ১৯৪৭-এ তারপর '৭১-এ। মুক্তি হচ্ছে আরো ব্যাপক বিষয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে সমাজ আছে তার মৌলিক পরিবর্তন। দুবার স্বাধীন হলেও আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। ব্রিটিশ আমলে যে সমাজ ছিল, যে রকম একটা সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তারা তৈরি করেছিল, সেটাই রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তির যে স্বপ্নটা ছিল, সেটা হলো এই সমাজ বদলাবে, এই রাষ্ট্র বদলাবে এবং কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসবে না, প্রকৃত মুক্তি আসবে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রকৃত মুক্তি বলতে বুঝি একটা মানবিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের মূল বিষয়টা হচ্ছে- অধিকার এবং সুযোগের সাম্য। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। তৃতীয়টা হচ্ছে, সর্বস্তরে ও পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা। প্রথমে মুক্তির স্বপ্ন বিষয়ে একধরনের অস্পষ্টতা ছিলো-মানে প্রথমে আমাদের যুদ্ধটাকে স্বাধীনতার যুদ্ধই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে যত মানুষের অংশগ্রহণ বাড়লো স্বপ্নটা যত বিকশিত হলো ততই এটা মুক্তির সংগ্রাম বলে পরিষ্কার হয়ে উঠল। এবং এই সংগ্রামটা দীর্ঘকালের। কিন্তু আমরা এটাকে এইভাবে আগে কখনও উপলব্ধি করিনি। যেমন ধরা যাক, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার কথা। '৪৭-এ আমরা স্বাধীনতার কথাই বলেছি। তখন মুক্তির কথাটা এইভাবে আসেনি। স্বাধীনতার জন্য '৪৭-এ আসলে আমরা কোনো সংগ্রাম করিনি। '৪৭-এ একটা দাঙ্গা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে দেশ ভাগ হল। আর তখন প্রকৃত অর্থে যা খুঁজল সেটা হল ক্ষমতার হস্তান্তর। ইংরেজ শাসকরা স্থানীয় শাসকদের কাছে (যাদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবি) রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে গেলো, ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলো। তবে পূর্ববঙ্গের মানুষের বুঝতে মোটেই বিলম্ব হল না যে, তারা প্রকৃত স্বাধীনতা পায়নি, মুক্তি তো অনেক পরের কথা। সেজন্য রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তৈরি হলো এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমাদের যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, তা শুরু হল।

তবে আমরা কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় একমাত্র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কথা বলিনি। যদিও পাকিস্তানে তখনকার জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫৬ জন ছিল বাঙালি। কিন্তু বলা হয়েছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই অর্থাৎ আমরা স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছি, ঐ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চলতে থাকল ধারাবাহিকভাবে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়েও আমরা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দিলাম। ৬ দফা যখন এলো, সেটাও স্বায়ত্তশাসনের দাবি। কিন্তু ক্রমাগত মানুষের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটা প্রতিষ্ঠা হল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পরে ৬ দফা এক দফায় চলে এল। সেই এক দফাটা হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তারও পরে মুক্তির কথাটা এলো অর্থাৎ আমাদের ঐ যে একটা সমষ্টিগত স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন আমরা দেখতে থাকলাম। আমরা চাইলাম, আমাদের এই সমাজের পরিবর্তন হবে, আগের সমাজ থাকবে না। এই রাষ্ট্র আগের রাষ্ট্র থাকবে না। রাষ্ট্রের আগের চরিত্রটা ছিলো ব্রিটিশ শোষকদের আমলেরই মতো। পাকিস্তানে আমাদের যে রাষ্ট্রটা ছিলো সেটা ব্রিটিশের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বিকশিত একটা রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্র ছিলো কাঠামোগতভাবে আমলাতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পুঁজিবাদী। অন্যভাবে বলা যায় কাঠামোটা আমলাতান্ত্রিক এবং লক্ষ্যটা পুঁজিবাদী। একে ভেঙে আমরা প্রকৃতভাবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চেয়েছি; কিন্তু সেই রাষ্ট্র আমরা পাইনি। এবং সেই রাষ্ট্র না পাওয়ার জন্যই আমাদের এই দুর্ভোগ।

আমরা এখন পর্যালোচনা করতে পারি কি কারণে কি ঘটল। আমি প্রথমেই লিখেছি যে একটা সমষ্টিগত স্বপ্ন ছিল, মুক্তির স্বপ্ন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন। কিন্তু বিজয়ের পর মুক্তি আমরা অর্জন করতে পারিনি। ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে ঐ সমষ্টিগত স্বপ্ন যেটাকে আমরা '৭১ সালের ঐ ভয়াবহ সময়ে নির্যাতনের মুখে, নিপীড়নের মুখে ধারণ করে রেখেছিলাম। যদিও তখন সময়টা ছিলো দুঃস্বপ্নের, হানাদাররা ঐ দুঃস্বপ্ন তৈরি করেছিল, কিন্তু আমরা সমষ্টিগত স্বপ্নটাকে ধারণ করেছিলাম। আমরা যে সংগ্রামটা করছিলাম, যে লড়াইটা করছিলাম, তার মধ্যে ঐ স্বপ্নটাই ছিলো চালিকাশক্তি যে সকলের মুক্তি আসবে। এবং ব্যক্তির মুক্তি সকলের মুক্তির মধ্যে নিহিত, এটা আলাদা করে আসবে না। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে যে পরিবর্তনটা এল তখন ব্যক্তিগত স্বপ্নটা বড় হয়ে দাঁড়াল, ঐসব সমষ্টিগত স্বপ্নের তুলনায়। সমষ্টিগত স্বপ্নকে পিছনে রেখে আমরা প্রত্যেকে নিজের মত ব্যক্তিগত স্বপ্ন দেখতে

থাকলাম। অর্থাৎ নিজের কতটা সম্পদ হবে, নিজে কতটা ক্ষমতা পাবো, নিজের কতটা প্রতিষ্ঠা হবে, নিজের কতটা সম্মান হবে, এটাই হয়ে দাঁড়ালো লক্ষ্য। এমনকি আমরা দেখেছি এরপর মুক্তিযুদ্ধের ওপর যারা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাদের লেখায় 'আমার দেখা '৭১, একাত্তরে আমার ভূমিকা, আমার সঙ্গে '৭১, '৭১ ও আমি' এই সকল বিষয়গুলোই উপজীব্য হয়ে এসেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্জন, ব্যক্তিগত ভূমিকাই প্রাধান্য পেল। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চালিকাশক্তি ছিল ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ, সেই ব্যাপারটা পিছিয়ে গেলো। নতুন নতুন বীরের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকলো। নতুন নতুন বীরত্বের কাহিনী বলতে থাকলেন। এবং সমস্ত ব্যাপারটা হলো ব্যক্তিগত অর্জনের মধ্যেই ব্যক্তির মুক্তি আছে, এই ধারণা চলে এলো। ফলে সমষ্টিগত মুক্তির খোঁজ ছেড়ে মানুষ তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে ভাবল। '৭১-এ আমরা মুক্তি খুঁজেছি সমষ্টিগত মুক্তির মধ্যে অর্থাৎ সকলে মুক্ত হলেই আমি মুক্ত হব। '৭১-এর পরে আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি, যারা দৃষ্টান্ত, যারা আদর্শ তারা প্রত্যেকেই ভেবেছেন যে তার সম্পত্তি তাকে মুক্তি দেবে, আমার সম্পত্তি যত হবে ততই আমি মুক্ত হব। আর এই ধারণার জন্য আমাদের ঐ যে সোনালী স্বপ্নটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, যেটাকে পাকিস্তানি হানাদার ভাঙতে পারেনি, সেটাকে আমরা ভাঙলাম বিজয়ের পরে। বলা যায় বিজয়ের পরে, এটা আমাদের একটা ঐতিহাসিক পরাজয় যে, আমরা সমষ্টি চিন্তা বাদ দিয়ে ব্যক্তি চিন্তাকে বরণ করে নিলাম। সঙ্গত প্রশ্ন যে এই ঐতিহাসিক পরাজয়ের দায়টা কার? দায়িত্ব দিতে হবে নেতৃত্বকে। কেননা নেতৃত্বই তো পরিচালনা করে, তারাই আদর্শ স্থাপন করে, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তাদের অনুকরণেই অন্যেরা শেখে। যে নেতৃত্ব আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামনে ছিল সেটা ছিলো জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব (আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে আগে সমাজতন্ত্রের কথা থাকলেও তারা আসলে জাতীয়তাবাদী)। এবং জাতীয়তাবাদীরা মনে করে তাদের যে ভূমিকাটা পালন করা দায়িত্ব সেটা '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে। তখন তারা আর ঐ স্বপ্নটাকে এগিয়ে নেয়নি।

গণতান্ত্রিক যে লক্ষ্যের কথা আমি বলছি সে লক্ষ্যটা আসলে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যই। এটা শুধুই নামের পার্থক্য। কিন্তু ঐ যে জাতীয়তাবাদীরা সমাজতান্ত্রিক ধারণা দিতে যাবে না। সেজন্যই সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্রের বিচ্ছেদ ঘটেছে। জিয়াউর রহমানের সময় সামরিক ফরমানের জোরে তিনি তা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে জাতীয়তাবাদীরা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাও সরকারে এসে নেতৃত্বের ওই আদিরূপটাকে ফিরিয়ে আনতে চাননি, ধর্মনিরপেক্ষতাও আনতে চাননি, বৈষম্য আর দূর করতে চাননি। কাজেই ব্যর্থতাগুলো যদি বলতে হয় সেটা নেতৃত্বের ব্যর্থতা। আবার ব্যর্থতা বলাও যাবে না এই অর্থে যে, জাতীয়তাবাদীদের কাছে আমরা কতটা আশা করব। আমরা জাতীয়তাবাদীদের কাছে আশা করব না যে তারা সমাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে, উত্তরণের জায়গাটাতে যাবে। ব্যর্থতা যদি বলতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সেই শক্তি যারা ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অন্যদিকে আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে একটা বিরাট ধস নামল। সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে আমাদের এখানকার মতো ধস অন্য কোনো দেশে নামেনি। কমুনিস্ট পার্টি নিজেকে বিলুপ্ত করে দিলো। এরকম সিদ্ধান্ত কোনো দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি নেয়নি। কম্যুনিস্ট পার্টির

প্রকৃত মুক্তি বলতে বুঝি একটা মানবিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের মূল বিষয়টা হচ্ছে- অধিকার এবং সুযোগের সাম্য। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। তৃতীয়টা হচ্ছে, সর্বস্তরে ও পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা

এই জাতীয়তাবাদীর অর্জনটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতো। যারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক যাদেরকে এককথায় বামপন্থী বলা যায়। কিন্তু ঐ বামপন্থী শক্তি আমাদের দেশে বিকশিত হয়নি। যেটুকু ছিল তার বিপর্যয় ঘটল। তাদের যে সবচাইতে বড় দল যেটা ছিল মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ন্যাপ, তারা আওয়ামী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মিশে গেল বা তাদের সঙ্গে এক সঙ্গে জোট করল। আর যারা পিকিংপন্থী তারা বিভ্রান্ত। তারা ছিন্নভিন্ন। তারা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ঐ গ্লানি তাদের মধ্যে আছে। ফলে তারা তখন এবং এখন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পরবর্তী সময়ে তাদের আবার অন্য জাতীয়তাবাদী বিএনপি তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। এবং ক্রমশ সেখানে চলে গেল। ফলে যে শক্তিটা এখানে নেতৃত্ব দিতে পারত আরো অগ্রগমনের জন্য, জাতীয়তাবাদী বিজয়ের মুক্তিটাকে ধরে সেটাকে গণতান্ত্রিক বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতো, যাবার যে কর্তব্য ছিল এদেশের সমাজতান্ত্রিদের, তারা সে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। এটা তাদের দিক থেকে আরেকটা ঐতিহাসিক পরাজয়, যে তারা এটা করতে পারল না। ফলে ঐ আওয়ামী লীগের ভিতর থেকেই জাতীয় সমাজতন্ত্রীক দল(জাসদ) বেরিয়ে এল। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নামটার মধ্যেই দেখা গেল যে তারা জাতীয়, মানে সমাজতান্ত্রিক না। এবং তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না তারা কিভাবে কি করতে চায়। তাদের লক্ষ্যটা ছিল যে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়েই তারা আন্দোলন করবে। আলাদা দল করেও তারা পারলো না, শেখ মুজিবের মৃত্যুর পরে তাদের আর কোনো ভূমিকা রইল না। তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বামপন্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তারা দুই দলে ভাগ হয়ে কেউ গেছে আওয়ামী লীগে, কেউ বিএনপিতে। যারা রয়েছে তারাও তাদের সম্পত্তি ভাগাভাগি হবে এবং নিজেদেরকে বিলুপ্ত করবে তারপর একদল বলবে যে তাদের দর্শন ভ্রান্ত ছিলো এই রকম ঘটনা আর কোথাও ঘটেনি। কাজেই স্বাধীনতার পর থেকে পুরো সময়টা জুড়ে আমরা দেখতে পেলাম যে একটা শাসক শ্রেণী এখানে গড়ে উঠল। যে শাসক শ্রেণী ঐ পুঁজিবাদী আদর্শে বিশ্বাস করে। কিন্তু পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র এক সঙ্গে যাবে না। কারণ পুঁজিবাদ বৈষম্য তৈরি করে। পুঁজিবাদ মুনাফা চায় আর গণতন্ত্র চায় বৈষম্যহীনতা। গণতন্ত্র চায় সমষ্টিগত কল্যাণ, ব্যক্তিগত মুনাফা নয়। তো যারা এখানে শাসক শ্রেণী, তারা মূলত একই শ্রেণী এবং সকলেই পুঁজিবাদে বিশ্বাস করে। সেজন্য দেখা যায় এ দল, ওই দল- তাদের মধ্যে পার্থক্যটা তেমন নেই। আজকে যে লোক এ দলে আছে কালকে ঐ দলে যেতে পারে। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের মত একটা বিকৃত প্রকৃতির মানুষকে নিয়ে টানাটানি চলছে। তারপর কে নমিনেশন দেবে, আজকে এদলে না পেয়ে কালকে অন্য দলে যোগ দেবে। এদের মধ্যে আসলে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। যৎসামান্য যা আছে সেটা মৌলিক না। এই যে শাসক শ্রেণী বাংলাদেশকে এখন শাসন করছে তারা মুক্তিযুদ্ধের ঐ চেতনাকে যে চেতনাটাকে আমি বলছি গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ার চেতনা এবং স্বপ্ন তারা সেটাকে লালন করে না। ক্ষমতা ভোগ করার প্রতিযোগিতায় তারা লিপ্ত। তাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সেটা হচ্ছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম দেখা যাচ্ছে না। তারা এদেশের ভবিষ্যৎ আছে বলেও মনে করে না। এই দেশের সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে। এদেশের গ্যাস, তেল, কয়লা চলে যাবে, এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর দুই দলের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়, কোনো বিরোধ দেখা যায় না। জনগণের সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক সম্পত্তি বেদখল হচ্ছে, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এসব ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

তাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়ার এবং সেটাই তাদের রাজনীতি, সেজন্য সমস্যাটা তৈরি হলো। আমি যেটা বলছিলাম ব্যক্তিগত স্বপ্ন ধারণ করার কথা, শাসক শ্রেণীর প্রতিটা ব্যক্তিই এ স্বপ্ন ধারণ করে। ঐখানেই তাদের ঐক্য যে তারা সকলেই ধনী হতে চায় এবং ধনী লোকদের একটা শ্রেণী এখানে গড়ে উঠেছে। যে শ্রেণী দেশকে শাসন করছে।

মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ছিল গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজের স্বপ্ন কিন্তু যুদ্ধের পর যারাই ক্ষমতায় এসেছে তাদের দ্বারা সেটা পূরণ হওয়া সম্ভবই ছিলো না। কেননা জাতীয়তাবাদীরা সমাজতন্ত্রী হয় না; কারণ তারা সমাজকে এগিয়ে নিতে চায় না শুধু ক্ষমতার হস্তান্তর চায়। জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতার রূপান্তরও চায় না। যেমন পাকিস্তান আমলে আমরা দেখলাম যে, ইংরেজ চলে গেল, পাকিস্তানি শাসকরা ক্ষমতা পেল। তখন আমরা মনে করলাম, পাকিস্তানি শাসকরা কেন ঐ জায়গা দখল করে আছে। আমরা ঐ জায়গাটা দখল করবো। এ জন্য ক্ষমতার হাত বদল হল কিন্তু মৌলিক কোনো পরিবর্তন এলো না। সেই আইন, সেই ব্যবস্থা, সেই আমলাতন্ত্র, সেই বাহিনী সবই অক্ষুণ্ন রইল। প্রকৃত অর্থে যেটা ঘটল সেটা ক্ষমতার হস্তান্তর। কাজেই তারা, যারা ক্ষমতার হস্তান্তর বিশ্বাস করেন তারা তো সমাজতন্ত্রী হবেন না। কারণ সমাজতন্ত্রের মূল কথাটা হচ্ছে- সমাজ কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন- বৈষম্য দূর করা, মানুষে মানুষে সাম্য তৈরি করা। জাতীয়তাবাদীরা তো ঐ লক্ষ্যে ছিলেন না। তারা চাচ্ছিলেন যে ক্ষমতা পাকিস্তানিদের হাতে আছে, পাঞ্জাবিদের হাতে আছে, আমরা ঐ ক্ষমতাটা নেব এবং তারা জনতার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ঐ ক্ষমতাটা পেয়ে গেলেন। মুক্তিযুদ্ধের জনগণই হচ্ছে চালিকাশক্তি, তারাই সংগ্রাম করেছে, তারাই বঞ্চিত হয়েছে, তাদের খবর কেউ রাখে না। তাদের ত্যাগের কোনো হিসাব নাই। এদের অংশগ্রহণ কিভাবে ঘটেছে তার খবর আমরা জানি না। নারী নির্যাতনে ইতিহাস আমাদের জানা নেই। কিন্তু উপরে উপরে কতগুলো মানুষের ভূমিকাকে বড় করে দেখানোর জন্য মিডিয়া চেষ্টা করে, দলগুলো চেষ্টা করে।

আওয়ামী লীগ কিন্তু সমাজতন্ত্রের কথা আগে বলেনি, প্রথমে বলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময়ে। এর আগে তাদের মুখে আমরা কখনো সমাজতন্ত্রের কথা শুনিনি। সেসময়ে বলেছে, কেননা সমাজতন্ত্র ছাড়া তখন মানুষ অন্য কিছু শুনবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্রের নাম করছেন তিনি যদি সমাজতন্ত্রের কথা বলেন তাহলে আবার একটা বিভাজন তৈরি হবে। এ জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষে সমাজতন্ত্রের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু সে বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার দৃঢ় ছিল না, দৃঢ় থাকা সম্ভবও ছিল না। তাদের সেই ধরনের প্রস্তুতি ছিল না। কাজেই যখন দেশ স্বাধীন হল কলকারখানাগুলো সব রাষ্ট্রীয়করণ হল সেখানে দলীয় লোকজনের একটা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হলো যারা নিজেদের সেগুলোর মালিক মনে করতে শুরু করল। তারা যন্ত্রপাতি, জমি, সম্পদ সব বিক্রি করে দিয়ে ওটাকে নিজেদের সম্পত্তি করার চেষ্টা করছে।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কথা ভাবলে খুব হাস্যকর লাগে যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তকের মধ্যে একজন ছিলেন বদরুদ্দোজা চৌধুরী। তিনি বিএনপি থেকে বেরিয়ে এসে এখন ১৪ দলের সঙ্গে ঐক্যজোট করার কাছাকাছি এসেছেন, যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাজনীতি করেছে! তবে বাঙালির জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির যে স্বীকৃতি তার মূলে আছে মুক্তিযুদ্ধ। এবং পৃথিবীতে বাংলাদেশের যে স্থান সেটা আমাদের ঐ মুক্তিযুদ্ধের কারণে অর্জিত হয়েছিল। কাজেই এটা হারিয়ে যাবার বিষয় না মোটেই। এটা কেবল যে স্মৃতিতে আছে তাও নয়, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে, আমাদের চিন্তার মধ্যে আছে, আমাদের ইতিহাসের মধ্যে আছে। ইতিহাসকে যতই কাঁটাছেড়া করা হোক এগুলো যাবে না। যে সংগ্রাম করে আমরণ একটা লক্ষ্য সামনে নিয়ে এগিয়েছি ঐ লক্ষ্যটা এবং আকাঙ্ক্ষাটা রয়ে গেছে। লক্ষ্যও আছে আকাঙ্ক্ষাও আছে। কাছেই স্থূলভাবে কতগুলো চিহ্নের সঙ্গে এগুলো দেখতে পাবো না যে মুক্তিযুদ্ধে চেতনা কতটুকু টিকে আছে। আর একটা বড় কথা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা হয়েছে এটা তো খুবই বড় অর্জন, এই দাবি তো আমাদের ছিলই না, আমরা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা চেয়েছিলাম কিন্তু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা যে হবে এই পূর্ববঙ্গের মানুষের সেটা তো আমরা তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, কিন্তু সেটা হল। তারপর এই যে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা এল এবং মুক্তির লক্ষ্যটা এখনো সামনে রইল। এগুলোসহ আরো অর্জন আমাদের আছে সেগুলোও আমি চিহ্নিত করতে পারবো, চিহ্নিত করার দরকার নেই। এসবই তো মুক্তিযুদ্ধের অর্জন।

আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক প্রস্তুতি একদমই ছিল না এবং সেটার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না তা বলা যাবে না। যেভাবে ছিল সে স্বপ্নটা হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাটা। এই চেতনাটা ছিল ভাষাকেন্দ্রিক। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী হলাম। এই যে পরিবর্তনটা এটার বিরাট সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে, আমরা জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ধর্মকে আর প্রধান উপাদান হিসেবে গ্রহণ করছি না। গ্রহণ করছি ভাষাকে। এবং ভাষা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক, ভাষা ধর্মনিরপেক্ষ, শাসক শ্রেণী নিরপেক্ষ। কাজেই আমরা তখন এমন একটা সংস্কৃতির কথা ভাবছিলাম যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভাজন থাকবে না, শ্রেণীর বিভাজন থাকবে না এবং সকলেরই একটা পরিচয় থাকবে তা হবে বাঙালি পরিচয়। আমি এখানে একটা বিষয় যোগ করব, বাংলাদেশ কিন্তু এক জাতির রাষ্ট্র নয়, এখানে যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে, তাদের আছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি। তাদের সংস্কৃতিগুলোকে আমরা বিকশিত হবার সুযোগ দেব এটিই ছিল লক্ষ্য। এবং এটিই প্রয়োজন যে তাদের সংস্কৃতিগুলোও নিজস্ব উপায়ে বিকশিত হবে। তাতে বাঙালি সংস্কৃতিও বিকশিত হবে, আদান-প্রদান চলবে, বৈচিত্র্যও আসবে। এর মাধ্যমে নানানরকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে কিন্তু আধিপত্য থাকবে না, এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক তাৎপর্য।

এই জনযুদ্ধ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের যেসব প্রেরণা পাওয়ার বিষয় আছে, সেগুলো হল- প্রথম কথা ইতিহাস, ইতিহাসের চর্চা। দ্বিতীয়ত ঐ কথাটা বলে বলে সামনে আনতে হবে যে আমরা একটা সমষ্টিগত স্বপ্নের কথা ভাবব। ব্যক্তিগত স্বপ্নের কথা ভাবব না, এটা মৌলিক বিষয়। এই যে প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, প্রত্যেকে পৃথক হচ্ছে, আমরা যদি এদেশে পরিবর্তন আনতে চাই, তাহলে বিচ্ছিন্নতা দূর করতে হবে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এবং ঐক্যের জায়গাটা কিন্তু ঐ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন। যাকে আমি বলছি, সমষ্টিগত স্বপ্ন, ওটাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। একদিকে ইতিহাস চর্চা হবে যে কিভাবে এ রাষ্ট্র এলো, আরেকটি হল মুক্তিযুদ্ধের সমষ্টিগত স্বপ্নটাকে সকলের মধ্যে সংক্রমিত করা। ঐ স্বপ্নের ভিত্তিতে তাদেরকে উদ্দীপ্ত করা, ঐক্যবদ্ধ করা। এটা হচ্ছে তাদের দায়িত্ব যারা দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রিক। এটা তো এমনি এমনি হবে না। এটা রাষ্ট্র করবে কি করবে না। কারণ রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর তো সে চরিত্র নেই। কাজেই যারা দেশপ্রেমিক মানুষ, যারা গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। (এ দুটোই লাগবে। খালি দেশপ্রেমিক হলে হবে না, খালি গণতান্ত্রিক হলেও হবে না।) এই যে আমাদের মাতৃভূমি, এই জনপদে আমরা থাকব, আমরা হাজার বছর ধরে আছিও তাই একে আমরা একটা সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করব। এই আকাঙ্ক্ষাটা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী মৌলবাদী শক্তির উত্থানের পেছনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ব্যর্থতা একটা কারণ তো বটেই, তারা তো কোনো কিছু দিতে পারলো না। তরুণদের ভবিষ্যতের স্বপ্নটা দেখাতে পারলেন না। স্বপ্ন তো বাস্তবায়িত হল না, এটা এক। দ্বিতীয় হচ্ছে যে, বেকারত্ব বেড়েছে, দারিদ্র্য বেড়েছে। যখন মানুষ বেকার হয়, দরিদ্র হয় তখন সে আশ্রয় খোঁজে, সে ভরসা খোঁজে, কিন্তু এখানে আশ্রয় এবং ভরসা সমাজ ও রাষ্ট্র দিচ্ছে না। মানুষ নিজেই নিজের জন্য সংগ্রাম করছে, বেকার থাকছে, হতাশায় ভুগছে, সে সুবিচার পাচ্ছে না, আশ্রয় পাচ্ছে না। সুবিচারের জন্য আশ্রয়ের

জন্য, সে তখন ধর্মের কাছে যায়। এই আশায় যে ধর্মে একালে না হলেও পরকালে একটা বিচার পাব। ধর্ম তাকে একটা ভরসা দিচ্ছে যে ন্যায়বিচার আছে, এটা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে পরিবর্তন না হওয়া এবং অবস্থার উন্নতি না ঘটা। মানে যে স্বপ্নটা ছিল সে স্বপ্নটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এবং বাংলাদেশ একটা বিধ্বস্ত স্বপ্নের দেশে পরিণত হল। তাই হতাশার কারণে, বেকারত্বের কারণে, দারিদ্র্যের কারণে মানুষ ঐ ধর্মের কাছে যাচ্ছে। তৃতীয় বিষয়টা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা। একটা ভয়ঙ্কর জিনিস এখানে তৈরি হয়েছে। আমাদের শাসকগোষ্ঠী তাদের সন্তানদের কখনো মাদ্রাসায় পাঠাবে না, পাঠাবে ইংরেজি মাধ্যমে। কিন্তু তারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে উৎসাহিত করে। দুই কারণে করে। এক, তারা মনে করে এটা ধর্মীয় কাজ এবং এটাতে সুনাম হবে সহজে। অল্প পয়সায় সামাজিক একটা সুনাম হয়। আর পরকালেও একটা জায়গা হয়। ইহকালে অনেক অন্যায় করছে তার বিপরীতে ভালো সওয়াব পাওয়া যায়। দুই হচ্ছে, তাদের মধ্যে অস্পষ্ট হলেও এটা আছে যে, গরিব মানুষকে আরো গরিব করে রাখতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষায় গরিবরা যায়, ওখানে গিয়ে তারা আরো গরিব হয়। এই গরিবির যে বন্ধন এটা একটা চক্র, সেখানে ওরা আটকে গেল। মাদ্রাসার ছেলে সে তো আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। তার দুটো অসুবিধা। একটা হচ্ছে সে কোনো উপযোগী বিদ্যা পায়নি যার দরুন সে উৎপাদনে অংশ নিতে পারে, দ্বিতীয়ত তার মধ্যে একটা অহমিকা জুটেছে যে, সে শিক্ষিত। কেবল শিক্ষিত নয়, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। কাজেই সে নৈতিকভাবে অন্য শিক্ষিতদের চাইতে উন্নত। সেজন্য সে বেকার থাকছে, হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই মাদ্রাসাগুলো থেকেই জঙ্গিগুলো আসছে। এই জঙ্গি শিক্ষা এবং এই মাদ্রাসা শিক্ষা এক সঙ্গে গঠিত। পাকিস্তান এক সময় মাদ্রাসা শিক্ষাকে উৎসাহিত করেছিল। তালেবানদের তারা তৈরি করেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়বে বলে। তারা এখন মাদ্রাসা নিয়ে বিপন্ন বোধ করছে, মাদ্রাসা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে এবং মাদ্রাসার সিলেবাস আধুনিকীকরণের চেষ্টা করছে। বিধি চালু করেছে যে তথাকথিত কওমি মাদ্রাসা সেগুলোও এখন ওখানে করতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষা যে কি রকম বিপজ্জনক হতে পারে সেইটা পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও ঐ মাদ্রাসা শিক্ষা যত বিস্তার হচ্ছে ততই আমরা ঐ জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করছি এবং তাদের লালন ভূমিকে পরিপুষ্ট করছি। আমাদের সরকারগুলো প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করছে, কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে মাদ্রাসা শিক্ষায়। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার কথা তো ভাবছেই না, যত পারা যায় বাড়াচ্ছে।

সমাজে এই নানারকম বৈষম্যের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ উঠছে না কারণ এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাগ হয়ে গেছে। '৭১ সালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে ভূমিকা ছিল সে ভূমিকা ছাত্রদের কার্যক্রমে আমরা দেখেছি। এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশ উঁচুতে উঠে গেছে। আরেকটা অংশ নিচুতে নেমে গেছে। যারা উঁচুতে উঠে গেছে তারা পুঁজিবাদী আদর্শে শাসকশ্রেণীর অংশ হয়ে গেছে। আর যারা নিচের দিকে নেমে গেছে তারা জীবিকার সংগ্রামে, জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত হচ্ছে। কাজেই শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্তরা আজ ঐ ভূমিকাটা পালন করতে পারছে না। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যেই ঐ শ্রেণীর মানুষগুলো আছে যারা সমাজের পরিবর্তন চায়। সেই মানুষগুলো কিন্তু আলোচনা করে। নিজেদের মধ্যে চিন্তা করে, অনুভব করে কিন্তু সংগঠিত একটা আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে পরিনি যেখানে এরা আসবে। এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিন্তু নিয়ামক। এরাই চায়ের দোকানে আলোচনা করে, এরাই খবরের কাগজ পড়ে। এরাই ভোটারদের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এরা যে সংগঠিত বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি, বিকল্প মানে বাম বিকল্প; সেই বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী শাসকশ্রেণীর উপরে বিক্ষুব্ধ, তারা সমালোচনা করে কে ঘুষ খাচ্ছে, কতটা খাচ্ছে তা নিয়ে হাসাহাসি করে, কোনো শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু তাদের সামনে কোনো বিকল্প নাই। সুতরাং বিকল্পটা তৈরি করতে হবে আজ। এই বিকল্পটা ডান দিক থেকে আসবে না সেটা আসবে বাম দিকে থেকে।

পশ্চিমবঙ্গে বামদের সাফল্য দেখে অনেকেই প্রশ্ন করে এখানে কেন হল না। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বামপন্থী কিন্তু এক না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসবে যারা পজিটিভ তারা প্রায় ৫০ বছর এগিয়ে ছিল আমাদের তুলনায়। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তারা লেখাপড়ায় এগিয়ে, চাকরি বাকরিতে এগিয়ে। আমাদের মধ্যবিত্ত কিন্তু পাকিস্তান আমলেই তৈরি হলো। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বামদিকে যাওয়ার সময়ে তাদের সামনে মুক্তিযুদ্ধ এসে তাদের স্বাধীন করে অনেক সুযোগ-সুবিধা এনে দিল। রাষ্ট্র তখন তাদের পক্ষে টেনে নিল। রাষ্ট্র তাদের টেনে নিয়ে রাষ্ট্রের সেবক, রাষ্ট্রের দাসে পরিণত করলো এবং জনগণের বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দিল। এখানে বাম আন্দোলনে তখনকার যারা নেতা ছিলেন তারা হিন্দুসম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ১৯৪৭ সালের পরে তারা নিপীড়িত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে কেউ আত্মগোপন করলেন। অনেককে জেলেও থাকতে হলো। কেউ কেউ চলে গেলেন ওপারে। তাতে একটা শূন্যতা তৈরি হলো। তখন মুসলমান বামপন্থী তৈরি হচ্ছিল মাত্র কিন্তু তারা তৈরি হতে পারে নাই। কেননা তাদেরকে পাকিস্তান আন্দোলনে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তারা তৈরি হওয়ার মুহূর্তে একটা শূন্যতা তৈরি হলো '৪৭-এর শূন্যতা। আবার '৭১-এর শূন্যতা যেটি একদিকে সুযোগ এনে দিল আরেক দিকে বামপন্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তারা দাঁড়াতে পারলো না তাদের নিজেদের অবস্থানে।

১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের হত্যার প্রতিক্রিয়া আমরা এখনও ভীষণ ভাবে বহন করছি। প্রথমত মেধাবান অনেক মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। দ্বিতীয়ত যারা কাজটা করলো তাদেরকে আমরা শাস্তি দিতে পারলাম না। তাদেরকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলাম না। যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে পারলাম না। এটা আমাদের ঐতিহাসিক একটা পরাজয়। এই যে বিচারটা করতে পারলাম না, এতে বোঝা গেল এরপরে ন্যায় বিচার এখানে পাওয়া যাবে না। এখানে হত্যাকান্ড চলতে থাকবে। বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরেও আরো অনেক হত্যাকান্ড চলেছে তারও কোনো বিচার হলো না। কাজেই বিচারের ব্যর্থতাটাও মানসিকভাবে খুবই ক্ষতিকর হয়েছে আমাদের জন্য। সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষতিকর হয়েছে আমাদের জন্য। আলবদর, রাজাকাররা এখন আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় চলে আসলো। নিজামী আলবদর বাহিনীর সংগঠক ছিল যে সে যখন মন্ত্রী হয়ে যায়, বড় বড় কথা বলে তখন মানুষের মনে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এই ব্যর্থতার বোধটা জাগে যে, তবে যারা শহীদ হলেন তাদের শহীদ হওয়াটা কোনো কাজে দিল না। তাদেরকে যারা নিশ্চিহ্ন করলো তাদের তো শাস্তি দিতে পারলাম না বরং তারা ক্ষমতায় চলে গেল। এটা একটা ব্যর্থতার বোধ তৈরি করে। কাজেই

> বাংলাদেশের আশু ভবিষ্যৎ আমি খুব একটা উজ্জ্বল দেখছি না। কিন্তু দূরবর্তী ভবিষ্যৎ আমি উজ্জ্বল মনে করি। কেননা এই যে নতুন প্রজন্মের কথা বললাম তারা কিন্তু কাজ করতে চায়। যারা দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রিক তারা যদি এই প্রজন্মকে সংঘবদ্ধ করে তাহলে মুক্তিযুদ্ধের যে ধারাবাহিকতা স্তিমিত হয়েছে তাকে আবারও বেগবান করা যাবে, গভীর করা যাবে

একদিকে মেধার ঘাটতি ঘটলো অন্যদিকে ব্যর্থতার বোধ তৈরি হলো, তৈরি হলো হতাশা।

তবুও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একেবারেই যে ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায় না। যদিও আমাদের চারদলীয় জোটের মধ্য দিয়ে জামায়াত একটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে, দেশে মৌলবাদী শক্তি বিকশিত হয়েছে, কিন্তু তারা বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছে। তারা ক্ষমা চায়নি। তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, তারা তো মুনাফেক। কিন্তু তারাও তো মেনে নিয়েছে যে এটা একটা ভিন্ন ব্যবস্থা।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে প্রশাসনে জামায়াতের লোক বিভিন্ন বড় বড় পদে চলে এসেছে এবং তারা অন্যদের তুলনায় যোগ্যতার প্রামাণ রাখছে। আমি মনে করি প্রশাসনকে কুক্ষিগত করার মিশন নিয়েছিল জোট সরকার। এবং তাদের বিএনপি অংশটি সম্পত্তি বাড়াতে ব্যস্ত ছিল। এই সুযোগে জামায়াত তাদের লোকদের বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে সফল হয়েছে। এদের নানান জায়গায় বসানো হয়েছে বিএনপির আশ্রয় থেকেই। সে লোকগুলো যোগ্য একথা বলা যাবে না। বসানোর পর তারা ক্ষমতা পেয়ে গেছে। ক্ষমতা পাওয়ার পর তাদের লিপ্সা আরো বেড়েছে। তারাও যে জামায়াত হয়েছে তার কারণও দেখা যাবে তাদের মধ্যেও আধুনিক যে শিক্ষা, গণতান্ত্রিক যে মূল্যবোধ সেটা তারা ধারণ করতে পারেনি। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলোই জামায়াতের সমর্থক হয়েছে। খুঁজলে দেখা যাবে তাদের মধ্যেও ব্যক্তিজীবনে ব্যর্থতাজনিত হতাশা আছে।

বিএনপি ক্রমশ জামায়াত নির্ভর হয়ে যাচ্ছে এটা বিএনপির জন্যও খুব খারাপ হবে। জামায়াত কিন্তু বিএনপিকে ব্যবহার করছে। বিএনপি টের পাচ্ছে না। মিছিলে দেখা যায় জামায়াতের লোকগুলোই আসছে কেননা জামায়াতের লোকগুলো নিজেরা মিছিল করলে ধাওয়া খাবে এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে। তাই তারা বিএনপির ছদ্মবেশে, বিএনপি সেজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। আসলে বিএনপি তো কোনো আদর্শ দল না। তারা কিছু লোক নানান জায়গা থেকে এসে এক সঙ্গে হয়েছে, যারা ক্ষমতায় গেছে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার কারণেই এখন এক সঙ্গে আছে। তাদের মধ্যে থেকে যে লিবারেল ডেমোক্রেটিক দল বেরিয়ে আসলো সেটাও কোনো মৌলিক পার্থক্যের কারণে না, তারা একই আদর্শের ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আবার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। ঐভাবে বিএনপির মধ্যে আরও ভাঙন হবে এবং তখন জামায়াতের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা আরও বাড়বে। ভোটের জন্য বাড়বে, কর্মীর জন্য বাড়বে, প্রচারের জন্য বাড়বে। এটাতে বিএনপি নিজের ক্ষতি করছে। এবং আমাদের দেশেরও ক্ষতি করছে জামায়াতকে প্রশ্রয় দিয়ে।

বর্তমান সমস্যা হচ্ছে বিএনপি তাদের ক্ষমতা থেকে চলে গেছে কিন্তু তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। নিয়ন্ত্রণ করছে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে। এটা একেবারে সোজা। এখানে কোনো অস্বচ্ছতা নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো কর্মকান্ডই আমরা দেখছি না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান যিনি তিনি তো টিমের প্রধান হবেন। কিন্তু টিমই নেই। তিনি নিজেই নিজেকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তিনি ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছেন যে এটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। উপদেষ্টারা যেসব সিদ্ধান্তে আসছেন সেগুলো কার্যকর হচ্ছে না। সুতরাং বিএনপি পিছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে বর্তমান সরকারকে।

আমি আওয়ামী লীগের সমর্থক না, আবার বিএনপিরও না। আমার অবস্থান ভিন্ন। কিন্তু আমি তো মনে করি আওয়ামী লীগের সামনে তো আর কোনো পথ নেই। বিএনপি প্রথমত চাচ্ছে একটা সাজানো নির্বাচন হোক, তারাই নির্বাচিত হয়ে আসুক অথবা এমন নির্বাচন হোক যেখানে আওয়ামী লীগ না থাকুক। নানা উল্টাপাল্টা চিন্তা বিএনপির মধ্যে আছে। আওয়ামী লীগের পক্ষে আন্দোলন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তারা এটাকে মেনে নিতে পারে না। কেননা তারাও নির্বাচনী দল। তারা তো আন্দোলনের দল না। কিন্তু নির্বাচন করতে হলেও তো একটা পরিবেশ থাকতে হবে। তাদের মধ্যে একটা আস্থা থাকতে হবে যে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে। কিন্তু এই কমিশনের ওপর সাধারণ মানুষের কোনো আস্থা নেই।

দেশের সংকটে সুশীল সমাজ মনে করে তাদের একটা আলাদা ভূমিকা থাকবে। সুশীল সমাজের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আছে যে তারা রাজনীতিবিদদের চাইতে অনেক বিশুদ্ধ, তারা অনেক যোগ্য, তারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এরকম একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা যেন আছে তাদের তৎপরতায়। কাজেই রাজনৈতিক মনঃকষ্টের ব্যাপারে তারা মাথা ঘামাচ্ছেন না বা সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে ততটা উদ্যোগী হচ্ছেন না। বুদ্ধিজীবীরা আবার দলীয়ভাবে বিভক্ত। অল্পকিছু বিএনপি আবার বেশিরভাগ আওয়ামী লীগ। কিন্তু তারাও দলীয় লোকদের ভাষায় কথা বলে। আরেকটা ব্যাপার হলো মিডিয়া এখন এতো হয়েছে যে কথা হারিয়ে যায়। আগে আমি খবরের কাগজে কলাম লিখতাম, তখন দেখতাম তার একটা প্রভাব পড়তো। এখন যদিও আমি লিখি না, কিন্তু যদি লিখি খুব একটা প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না।

এত বিরুদ্ধ স্রোত সত্ত্বেও আমি সবসময় আশাবাদী। আমি মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধ খুবই প্রত্যক্ষ এবং এটা আমাদের অঙ্গীকারের মধ্যে আছে। আর এ দেশের মানুষ ধর্ম পালন করে তবে রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে মেশায় না। এখানকার রাজনীতি সবসময় ধর্মনিরপেক্ষ। রাজনৈতিকভাবে আজকে মৌলবাদী শক্তিগুলো এখানে নানারকম দৌরাত্ম্য করছে। এটা শুধুই জোটের কারণে, জামায়াত যদি বিএনপি জোট থেকে বেরিয়ে আসে তবে তার অবস্থা আগের যে কোনো অবস্থার চাইতে খারাপ হবে। কেননা ইতিমধ্যে জামায়াত যে আদর্শবাদী কোনো দল না, তারাও যে আওয়ামী লীগ-বিএনপির মতো ঐ একই রকম দল তা প্রমাণ হয়েছে। তাদেরও মূল লক্ষ্য ক্ষমতার লিপ্সাই, তারাও যে সম্পত্তি বৃদ্ধি করছে, ঘুষ খাচ্ছে, আদর্শবাদিতা নাই এগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাজেই এখন সে জোটের মধ্যে আছে, জোটকে আঁকড়ে ধরে আছে। জোটের বাইরে চলে এলে তার কোনো অবস্থানই থাকবে না। সেজন্য ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। এদেশের মানুষ ধর্ম-নিরপেক্ষ, রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ। দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রী যারা আমরা নিজেদের মনে করি তাদের কর্তব্য হলো এই কথাগুলো নতুন প্রজন্মকে বলা, কাজ হলো আমাদের স্বপ্নকে ধারণ করা, লালন করা এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করা। আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের আশু ভবিষ্যৎ আমি খুব একটা উজ্জ্বল দেখছি না। কিন্তু দূরবর্তী ভবিষ্যৎ আমি উজ্জ্বল মনে করি। কেননা এই যে নতুন প্রজন্মের কথা বললাম তারা কিন্তু কাজ করতে চায়। যারা দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রিক তারা যদি এই প্রজন্মকে সংঘবদ্ধ করে তাহলে মুক্তিযুদ্ধের যে ধারাবাহিকতা স্তিমিত হয়েছে তাকে আবারও বেগবান করা যাবে, গভীর করা যাবে। আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো বলতে পারবো না তবে আমি মনে করি আমরা যারা নিজেদেরকে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক বলে মনে করি তারা কোন ভূমিকা গ্রহণ করছি তার ওপরই ভবিষ্যৎটা নির্ভর করবে। আমরা যতটা এগোবো ততটাই ভবিষ্যতে উজ্জ্বল হবে। আর আমরা যদি পিছিয়ে যাই, হতাশ হয়ে পড়ি তাহলে শুধু হতাশার কারণ থাকবে, উজ্জ্বল হবে না ভবিষ্যৎ।

এখানে একটা বড় সমস্যা হয়েছে আজকের তরুণদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। শাসকশ্রেণীই এটা করছে। কিন্তু আশার কথা হচ্ছে শাসকশ্রেণীকে কিন্তু এই তরুণ সমাজ আবার শ্রদ্ধা করে না, মান্যও করে না। তরুণদের মাঝে বীরত্বের আগ্রহ থাকে, দুঃসাহসিক কাজ করতে চায়। যে দেশপ্রেমিক সে দেশকে কি পরিচয়ে পরিচিত করাবে এই আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে থাকে। ঐ জায়গাটাতে কাজ করার আছে। সেই কাজটা সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও রাজনৈতিকভাবে করতে হবে। কেবল রাজনীতি দিয়ে এটা হবে তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ভূমিকাও খুব বড়। আমরা এই বিষয়গুলোকে অনবরত বলতে থাকবো লিখতে থাকবো, নাটকে, গানে, কবিতায় এসব আনবো। মুক্তির যে লক্ষ্য সামনে আছে এগুলোকে আনবো। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মুক্তি নেই, ব্যক্তিগত চেষ্টার মধ্যে মুক্তি নেই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির মধ্যে মুক্তি নেই। এই প্রত্যয়গুলোকে সামনে তুলে আনতে হবে। এটা কিন্তু কঠিন কাজ, তবে জরুরি কাজ এবং অপরিহার্য।

হায় স্বাধীনতা! আজও মুছতে পারলে না চাবুকের ক্ষত

সেলিম আল দীন

বহু বছর আগে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবনীকার- এই সুমহৎ বাঙালির একটি উক্তি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই পুস্তকে লেখা ছিল যে, সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের ভাবনায় হিংস্র এবং যুদ্ধরত ইংরেজরা বাংলাদেশের কৃষকদের ধান লুটে নিয়ে (দাম দিয়েছিল হয়তো) নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিল। দিয়েছিল এই জন্য যে, ভাত যাদের প্রধান খাদ্য তারা যেন ইংরেজ উপনিবেশের এই অঞ্চল দখল করে খেতে না পায়। সম্ভবত তখন ইম্ফলের পতন ঘটেছিল– নেতাজির সৈন্য বাহিনীর হাতে। জাপানিরা আকাশ থেকে কিংবা অন্যভাবে তাদের সম্রাটের ছবিঅলা কাগজের নোট ছড়াচ্ছিল। আমার দাদী মরহুমা আঞ্জুমান আরা খাতুন সে গল্প বলেছিলেন। আমার আম্মা জাপানি বোমার ভয়ে ফেনীর লেমুয়া অঞ্চলে তাঁর বাড়িতে পুকুর পাড়ে আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। ট্রেঞ্চের ধারণা তখনও ছিল না।

সেলিম আল দীন

যে গ্রন্থের কথা বলছি– সেটি *শতাব্দীর সূর্য*। শেরে বাংলার অসাধারণ জীবনের সরলতম ভাষায় রচিত। সেই গ্রন্থের সেই উক্তিটি এখনও আমার মনে দাগ কেটে আছে। ইংরেজদের বাঙলার কৃষি ধ্বংসের সর্বশেষ আয়োজনে শেরে বাংলা বলেছিলেন যে, এই অপঘাতের কারণে আগামী ১০০ বছরেও বাঙালি কৃষক মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন্ত সাক্ষীরূপে বলতে পারি– শেরে বাঙলার এই ভাগ্য কথাটা আজও সত্য হয়ে আছে। সেই সত্য হাটের পণ্যে কোষা নৌকার সম্ভারে হাইব্রিড ধানের উৎপাতে– ছাপমারা সত্য হয়ে আছে।

খাদ্যে উদ্বৃত্ততার অভিযানের শুরু বঙ্গবন্ধুর আমলে– 'সবুজ বিপ্লব' দিয়ে। সেই তারুণ্য পেরুনো বয়সে কথাটার অন্তর্গত মর্ম বুঝিনি– বুঝতে চাইওনি। তখন ভেবেছি সুনির্দিষ্ট একটা রাষ্ট্র কাঠামো– কঠিন ফ্রেমে বাঁধা এবং মার্কসীয় দর্শনে যা যা বলা হয়েছে– তা তা মানলেই তো সব সমস্যার সমাধান। এই রকম একটা স্বপ্ন বিলাসের বিরুদ্ধে উনিশ শতকেই দস্তোয়ভস্কি একটা অমৃত মন্তব্য করেছিলেন। একজন সমাজবাদী চরিত্রের সঙ্গে আরেকজনের বিতর্কে চরিত্রটি বলেছিল– মানব সভ্যতার অগ্রপশ্চাতের ধারা বিবেচনা না করে যাঁরা বিশেষ একটা কাঠামোকে সামাজিক উন্নয়নে অনিবার্য করে তোলে যদি তাতে শেষ অবধি কোনোই ফল ফলবে না।

কথাটা এই জন্যে বলা যে– তখন আমরা সবুজ বিপ্লব বুঝিনি মতবাদের চাপে আর যারা সবুজ বিপ্লবের ঝান্ডা ওড়াবেন তারাও জানতে না সবুজ বিপ্লবের অন্তর্গত অর্থটা কি। উদ্বৃত্তখাদ্য না উদ্বৃত্ত স্বস্তি। যে কৃষক এই বিপ্লবের যোদ্ধা তার সঙ্কল্প কি– তার অন্তর্গত জীবন ও দর্শনের শক্তি জোগাবার আয়োজন কি।

আমরা যারা সেদিন বঙ্গবন্ধুর কথা বুঝিনি তাদের সঙ্গে কৃষকের কোনো সম্পর্ক ছিল না– যাঁরা এই নির্দেশ পালনের জন্য পা বাড়িয়েছিলেন তাঁরাও জানতেন না বাড়ানো পা-টা তাঁদের– কৃষকের ঘাড়ে না বাড়ির কোনে কৈ শিং মাগুরের আবাসস্থল– পানাঅলা পাগাড়ে পড়বে।

তারপর হত্যা- রক্ত প্লাবনে রক্তাক্ত স্বদেশ। অনতিবিলম্বে সবুজ বিপ্লবের পথে এলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি– মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান। তিনি স্বয়ং কর্মোদ্যোগী হয়ে মৃত খাল পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর সেই বিদিত ছবি- চোখে কালো চশমা, গায়ে সাধারণ গেঞ্জি এবং স্থান ধানক্ষেত। এর পরপরই ফের রক্তের জমাট মানচিত্র।

এখন বুঝতে পারি তাঁদের স্বপ্নের ভেতর সত্য ছিল কিন্তু যে পথে বাঙালি কৃষকের মুক্তির উদ্ঘাটন তা তাঁদের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না বা খুনিরা সে সময়টুকুও তাঁদের দেননি।

কৃষকেরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতির জন্য কেঁদেছে– জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের খবর শুনে ভেঙে পড়েছে শোকে। হয়তো তারা ভেবেছিল– রাষ্ট্রের চূড়ান্ত শীর্ষ যখন সোনার ধানের ক্ষেতে, কি খরার দুর্দান্ত দহনের পাশে এসে দাঁড়ায়– তখন আর ভয় কি। হয়তো তারা ভেবেছিল- পেটভরা ভাত আর উদ্বৃত্ত ধানে জীবনের প্রান্তিক কামনার পাশে বেজে উঠবে নামাজের আহ্বান ধ্বনি, শরতে-বসন্তে-শীতে হাতের সরোদে বাজবে গাজীর গান– কীর্তনের পালা। তারা ভেবেছিল, এমন কিছু ঘটবে যাতে অবশ্যম্ভাবী অন্নহীনতার দেশে তারা উদ্বৃত্ত খাদ্য পাঠাবে– দোয়ার জন্যে– কল্যাণের নিমিত্তে।

বৃদ্ধা মা একটি পুরনো ফটোগ্রাফ চোখের সামনে মেলে ধরে আছেন। মা চোখে দেখেন কি দেখেন না। পাশের কেউ একজন ধমক দিয়ে ওঠে। চোখেই দেখো না তাও ছবির দিকে চায়া থাকো কেন। : কেন। আমার পোলাখান তো বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপায়া পড়ছিল। আর মরছিল কলমাকান্দায়। না বাজান লাশ তো তার মিলে নাই। শখ কইরা একবার শহরে গিয়া ফটো তুলছিল একখান– তাই আছে। সেই হাত– আয়না কাঁকন আছে বেড়ার গোঁজে। আর শেষ ঈদে ধান বেইচা যে শখের পাঞ্জাবিখান বানাইছিল সেইখান।

: বুড়া হইছি তো দেখেন না চোখের ভুরু পর্যন্ত পাকছে। ছানি কাটাইছি দুইবার। দেখেন তো রঙটা পর্যন্ত কেমন মইলান

হইয়া গেছে। আহা পঁয়ত্রিশ বছর তো।

: আহা যাদুরে কোন গোর তরে ছাপায়া রাখছে। কেন রাখছে। মায়ের চিৎকার।

দুর্গাপূজার ঢোল বাজছে– আজ মহালয়া। মা শাদা শাড়ি পরে ঘরের কোণটিতে বসে আছেন।

: তুই না কইছিলি বাবা মেঘালয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং করবি। করছিলি বাজান।

: হ।

: তারপর মরলি কিবা কইরা ও জান– ও পরান রে।

: মরছি মাগো বুকে গুলি খায়া। দুই নম্বর সেক্টরে সিংহের মতোন কলিজা খালেদ মোশাররফ– তাঁর আন্ডারে ছিলাম। আমি আর আমিনালি– এই যে আমার বন্ধু-

: চিতা পাস নাই বাবা।

: মুক্তিযোদ্ধার চিতা কি মা। যুদ্ধই যার ঠিকানা তার চিতা কিয়ের।

ধমকে ওঠে কেউ।

একা একা কার লগে কথা কও।

: কই বাজান

হু হু করে কেঁদে ওঠে মা। মহালয়া। তবু ছেলে তার ফেরেনি একাত্তরের রণক্ষেত্র থেকে।

কার্তিকের ধানের পরে দিগন্ত ছেয়েছে সর্ষে ফুলে। ও পাড়ার হাতেম আলীর চোখে স্বপ্ন–দিগন্তের পাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। ঐ ক্ষেতটা তার ছিল, এখন যে নিজের ক্ষেতেই বর্গাচাষী। সহসা প্রবঞ্চনার ক্ষোভে উঠে দাঁড়ায়। নব্য মহাজনীর ঋণ শোধ করতে। বাড়ির ভিটার ক্রোক বাঁচাতেই না ঐ তিরিশ ডিসিম জমি বন্ধক দেয়া। এখন ওখানে সর্ষে ফুল ফোটে– এখন ওখানে মটর লতার ফুল।

২.

পাল যুগে কৃষির উৎকর্ষ কতোটা হয়েছিল সে সন্ধান ইতিহাসবিদরা কিছু বলেছেন কি না জানা নেই। মোটা দাগের ইতিহাসে অবশ্য লেখা আছে যে ঐ কালে গৌড় সাম্রাজ্য কাশ্মীর ও সিন্ধুর তীর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু চর্যাপদে নিরন্নের চিত্র আছে। তবে সে নিরন্নতা রাজ্যের বা নিসর্গের সৃষ্টি কি না তা বলা হয়নি। কিন্তু, ইতিহাস যাই বলুক, ধর্মের প্রাধান্যে পণ্যের প্রাধান্য কমে আসে। আসে বলেই বাঙালি সভ্যতার কোনো পর্বে বিশাল ও ব্যাপৃত বাণিজ্য সম্ভার সমুদ্র পাড়ি দিতো তা অনুমানের ব্যাপার। সেন যুগে ধর্মের বাড়াবাড়ি ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল অনার্য শ্রেণীর মানুষের ওপর। কিন্তু পাল বা সেন কাল যাই বলি, বাঙালির কৃষি কুশলতা, কৃষি ও খনিজ পণ্যের উদ্ভাবন ক্ষমতা চিরকালই ভারতখ্যাত ছিল। জাফরানের চাষ ছিল মেঘনার কূলে– আবার মেঘনার পানিই ছিল মসলিন বয়নের

যখন মুক্তিযুদ্ধ হলো, ভদ্রলোকের সন্তান আর কৃষক এক পঙক্তিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলো, শহীদ হলো। রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এল বিজয়ীর বেশে। স্বাধীন দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। অথচ কী দুর্ভাগ্য! আমরা আমাদের পাশে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়া কৃষকের ছেলেটিকে ভুলে গেলাম। আমরা গ্রাম থেকে নগরকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। যুদ্ধের সুফলটা চলে গেল নগরে আর গ্রামের জন্য রইল অনুকম্পার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

অনুকূল। চাল, পারদ, ভোঁদড়ের চামড়া, চন্দন কাঠের নানা সামগ্রী, মাছরাঙা পাখির পালক হাতির দাঁতের বিচিত্র পণ্য– পিতল কাঁসা-পারদ- এমনকি আকরিক লোহারও রপ্তানি সংবাদ আছে ইতিহাসে। চীন সাগর আরব সাগর থেকে ভেনিস পর্যন্ত বাঙালাদেশের পণ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল। পণ্যের অবাধ চলাচলের নিমিত্তেই সুলতানী আমল বিশেষত হোসেন শাহী আমলে চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

মুঘল আমলে গৌড়বন্দের স্বাধীনতা পর্যদুস্ত হলেও টোডরমলীয় ভূমি ব্যবস্থার সুফল ফলেছিল। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এই ব্যবস্থার অবনতি ঘটে এবং ভূমি কর সংগ্রহকারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অমর কবি কঙ্কণচণ্ডী এই প্রদোষকালের কথা লিখেছেন। সে বড় মর্মান্তিক– বেদনাবহ। জাহাঙ্গীরের আমলে দুর্ভিক্ষের কালে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের পাশে গুজরাট থেকে আমদানি করা নানা জাতের ডাল স্থান করে নেয়।

মুঘল রাজত্বের শেষ দিকটাতে বাঙালির কৃষি ব্যবস্থা, বিপণন ব্যবস্থা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আলীবর্দী খাঁর সিংহাসনারোহনের আগ থেকেই মরহট্টা বা মারাঠি দস্যুদল বাংলার সীমান্তে হানা দিতে থাকে। হুগলি থেকে শেষ অবধি যশোর পর্যন্ত তারা ব্যাপক লুণ্ঠন চালায়। কূটকৌশলে নবাব আলীবর্দী খান কিভাবে মারাঠি দস্যু প্রধান ভাস্কর পন্ডিতের মাথা কেটে নেন– এর উত্তেজক বর্ণনা আছে *সিয়ারে মুতাখ খারিনে*। ধানের ক্ষেতে আগুন, গোলায়– বসত ভিটায় আগুন, নারী এবং সোনাদানা লুণ্ঠন– এ সব ছিল তাদের সৃষ্ট বিভীষিকার ভগ্নাংশ মাত্র। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিত। শুধু এই জন্য যে, বাংলার নবাবের কাছ থেকে মারাঠি দস্যুরা যেন বাৎসরিক চৌথ পায়।

ঠিক এই অরাজকতার কালে এলো ইংরেজরা। ওরা জানতো সমগ্র ভারতে সর্বাপেক্ষা কৃষি ও কৃষিপণ্য সমৃদ্ধ দেশ সুবেই-ই-বাঙলা। সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে মৌলিক দ্বন্দ্বটা ছিল ওদের ব্যবসার। বাঙালির ব্যবসা থেকে নবাব কর রূপে যে অর্থ পেতেন তাই ছিল যথেষ্ট।

সঙ্গে শস্য, ভূমি করের চিরকালীন নিয়ম। ব্যবসার শৃঙ্খলাটা ভাঙলো যখন রাজকোষে অর্থ ঘাটতি দেখা গেল। এদিকে অর্থলগ্নীকারী জগৎশেঠ ইংরেজদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ব্যাংক ব্যবস্থার একটা আদি ছাঁচ গড়ে তুললো। কিশোর নবাবকে বাধ্য করলো জগৎশেঠের ওপর অর্থ সহায়তার জন্য নির্ভরশীল হতে। মীর কাসিম সিরাজ বিরোধিতায় নামলেন এবং সিরাজ হত্যার পর মীরজাফর এবং মীরজাফরের পর মীর কাশিম যখন নবাব হলেন তাঁকেও শেষাবধি একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। পরিণামে উদয়নালার যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয় এবং করুণ মৃত্যু।

৩.

পলাশীর যুদ্ধের পরে বাঙালির কৃষি আর বাঙালির হাতে রইল না। ঘন ঘন বিদ্রোহ উচ্চকিত একটি দেশে একদল ইংরেজ তাঁবেদার শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। জন্মে সৃষ্টি হলো কৃষকের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি ভোগ দখলের জন্য একটা বিশেষ শ্রেণী। প্রথাটা ইউরোপে ছিল মানবাধিকারের সীমার মধ্যে না হলেও সহনীয়, রাশিয়াতেও ছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অর্থাৎ এক একটা বিশাল অঞ্চল নিলামে তুলে নির্দিষ্ট হারে নিলাম গ্রহীতার কাছ থেকে কর আদায়। সূর্যাস্তের আইনের অধীনে কাজটা করা হলো যাতে প্রজা রক্ষার চেয়ে জমিদার পাতাল পর্যন্ত খুঁড়ে এনে ইংরেজ সরকারকে দেয় অর্থ পরিশোধ করেন। ফল দাঁড়ালো কৃষি সম্পর্কহীন পূর্বাপর কৃষি সম্বন্ধবিহীন ধনী মানুষদের জমিদার, রাজা, নবাব খেতাব ধারণ। সে ইতিহাস কম বেশি সবার জানা। জমিদারি প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে বাঙালির কৃষি

কৃষকের হাতে কোকাকোলার বোতল নয়, সরোদ কি মন্দিরাটা বাড়িয়ে দিন। লালনের গানের ভেতর দিয়ে তারা যেন ফিরে পায় ভাবলোকের অতল স্পর্শ। ঐ পুকুর পাড়ের থানকুনি শাকের সঙ্গে শিঙি মাছের ঝোলের স্বাদে জীবন ঘিরে থাকুক তাদের...

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হলো। ইতিহাসে পড়েছি যে, খাজনা দেয়ার ভয়ে বহু কৃষক পরিবার রাত আঁধারে দেশান্তরী হতো। পরে এমন আইনও জারি হয়েছিল যাতে সর্বস্বান্ত কৃষক এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য জমিদারের এলাকায় না যায়।

যে বাঙালি কৃষক ছোটো আঁশের কার্পাস থেকে বয়নের রূপকথা সৃজন করেছিল সে পরিণত হলো ক্রীতদাসে। বাঙালাদেশে সুলতানী আমল ছাড়া ক্রীতদাস প্রথা আক্ষরিক অর্থে চালু ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা সে ক্রীতদাস প্রথাটা চালু করেছিল অন্যরূপে– অন্যভাবে। অদ্ভুতের চেয়েও বড়ো ভূত, যে ফসল ফলায় সে হলো ম্লেচ্ছ, আর যারা ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজি আনিয়ে কৃষকের অর্থে আমোদ উপভোগ করতো তারাই হলো পূজ্য।

পাকিস্তানি আমলে বেশ মনে আছে আমেরিকা থেকে চাল এনে রেশন দেয়া। বহু পরিবার চাল না পেয়ে অভুক্ত থাকতো। আইয়ুবের উন্নয়নের দশ বছরে দেখা গেল, গ্রামের লোক উপাস দিচ্ছে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব কি সিন্ধুর ঊষর ভূমিতে জল সেচে ফলানো বাসমতি চালের ব্যবস্থা। তখন ঠিক বুঝতাম না কেন এই আয়োজন। গ্রামে রেশন চলছে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাসমতি।

এখন বুঝতে পারি দেশকে যারা পরিচালিত করবেন তাঁদের পায়ের নিচেই থাকবে অনাহারী কৃষক দরিদ্র ভিক্ষুক এবং নিরন্ন মানুষেরা।

৪.

ষোলই ডিসেম্বর সামনে। এই তো গেল আষাঢ়ে গাছ বুনতে গিয়েছিলাম সেনেরখিল। আমি বর্গাদারদের কাছে চাইলাম দেশজ ধানের চাল। ওরা মুচকি হাসে। নেই তো। সব হাইব্রিড। হঠাৎ পাওয়া গেল খুব সাধারণ দেশী ধান– চিকনাল। মুখটা তীক্ষ্ম সাদাটে সোনার শরীর আর কী অপূর্ব অথচ সাধারণ চাল। আমরা জয় বাংলা উচ্চারণ করছিলাম যুদ্ধে, তবে কি সেটা যুদ্ধে জেতারই স্লোগান! সেটা কি এই নয় যে, আমরা আমাদের কৃষিতে বিজ্ঞান ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফসল উৎপাদন করবো।

ভূমিতল থেকে নিরাপদ ঋতুতে ধানচাষ হচ্ছে– ধানের বাম্পার ফলন হচ্ছে। ভালো, কিন্তু ভূমির ভেতর থেকে তোলা পানিতে অপ্রয়োজনীয় খনিজ জমা হতে হতে একদিন কি তা আমাদের কৃষি ক্ষেত্রগুলিকে একেবারে বন্ধ্যা করে দেবে না! কে এমন কৃষি বিজ্ঞানী আছেন, যিনি এই কথা বলতে পারেন যে যা বলেছি অর্থাৎ ঐ যে অপ্রয়োজনীয় ভূমিতলে থাকা খনিজ ওপরে জমা হতে হতে ভূমির উপরিত্বকের ক্ষতি সাধন করবে না। এখন থেকে একশ' বছর পরে এর ফলাফলটা কি হবে সেটা ভাববো কি না।

৫.

আজ ষোলই ডিসেম্বর। অত্যউজ্জ্বল বিজয় সূর্য দিন। পঁয়ত্রিশ বছর তো হলো– তবু এখনও শেরে বাংলার সেই কথাটাই কি সত্য হবে। সত্য হবে সে কথাটা যে, বাঙলার কৃষক আর শতবর্ষে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অথচ কৃষক পরিবারের সন্তানরাই সেদিন রণক্ষেত্রে দুর্বার আবেগে ছুটে গিয়েছিল। কুলমানহীন কৃষকের সন্তানেরাই রাইফেল তুলে নিয়েছিল।

নিয়েছিল এই জন্য কি যে, দেশ স্বাধীন হলে তারা ভদ্রলোকদের, বিত্তবানদের জুতা কাঁধে নিয়ে ফিরবে। আমরা যুদ্ধ করেছি, স্বাধীন হয়েছি অথচ কৃষিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চৌকাঠের বাইরে ভিক্ষুকের বেশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। সরকার কৃপা করবে, কৃষি ব্যাংক সুদে টাকা দেবে, গ্রামীণ ব্যাংক স্বস্তিহীন টাকার আবর্তনে বেঁধে রাখবে দরিদ্র ও ভূমিহীনকে। রাখুক, কিন্তু তাতে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ঘটবে কি?

আমাদের কৃষিকে সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করতে হবে, আমাদের কৃষিকে সামাজিকীকরণের বৃত্তে আনতে হবে। এবং এ কথা বোঝাবার জন্য এ দেশে কি দু'জন মানুষও নেই যাঁরা নাগরিক বিচ্ছিন্নতাকে অজস্র নদী সংবলিত এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের কৃষির সঙ্গে যুক্ত করে দেবেন!

কৃষকের হাতে কোকাকোলার বোতল নয়, সরোদ কি মন্দিরাটা বাড়িয়ে দিন। লালনের গানের ভেতর দিয়ে তারা যেন ফিরে পায় ভাবলোকের অতল স্পর্শ। ঐ পুকুর পাড়ের থানকুনি শাকের সঙ্গে শিঙি মাছের ঝোলের স্বাদে জীবন ঘিরে থাকুক তাদের।

ভাবলোকে লালনের পাশে আসুক রুমী, হাফিজ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল। আসুক পৃথিবীর সফল ধ্রুপদী গ্রন্থ। তার খড়ের চালের নিচে কথকতা হোক হোমারের, শেক্সপিয়ারের, বাল্মিকী ব্যাসের। তার খড়ের চালের নিচে আসুক বিজ্ঞান- প্রযুক্তি- কম্পিউটার।

হায় স্বাধীনতা! বাঙালি কৃষকের পিঠ আর বুক মুখ থেকে তুমি উপনিবেশের চাবুকের ক্ষত আজও মুছতে পারলে না।

হাতেমালির মা, পিঠা সাজান কার্তিকে। কলমাকান্দার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরবে তার ছেলে– আয় আয় বাজান।

কল্যাণী রায়, আশি বছর তবু মরে না, আহা প্রতাপ– অমন রাত নিশুতে মা মা বইলা কানতে নাইরে।

যখন মুক্তিযুদ্ধ হলো, ভদ্রলোকের সন্তান আর কৃষক এক পঙক্তিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলো, শহীদ হলো। রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এল বিজয়ীর বেশে। স্বাধীন দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। অথচ কী দুর্ভাগ্য! আমরা আমাদের পাশে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়া কৃষকের ছেলেটিকে ভুলে গেলাম। আমরা গ্রাম থেকে নগরকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। যুদ্ধের সুফলটা চলে গেল নগরে আর গ্রামের জন্য রইল অনুকম্পার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

এই বৈষম্যের মূল্য দিতে হবে নগরকে, আমাদের সবাইকে। কৃষকদের শুধু বুঝতে দিন– কেন এক সঙ্গে যুদ্ধ করে নগর আর গ্রামের এতোটা পৃথকত্ব রচিত হলো। দেখবেন ওরা এসে শহরের সিংহ দরোজার কড়া নাড়বে এবং চিৎকার করে বলবে– দরোজা খোলো, আমরা লুট করতে এসেছি তোমাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ।